বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মান পুনরুদ্ধার অসম্ভব নয়

মোহাম্মদ আতাউল করিম

০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:২৭
আপডেট: ০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৩৭

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এক হাজারের মধ্যেও থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই গবেষণার পরিবেশ। এসব নিয়ে কথা বলেছেন পদার্থবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথের নির্বাহী উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) মোহাম্মদ আতাউল করিম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মুনির হাসান**।

প্রথম আলো: আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আর মানসম্মত গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারছে না বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। বিষয়টি আপনি কতটা যৌক্তিক মনে করেন?

মোহাম্মদ আতাউল করিম: বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা শত শত গ্র্যাজুয়েটের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ ধারণার সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করতে চাই। বাংলাদেশ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা সেরা শিক্ষার্থীরা এখানেও ভালো ফল করেন। বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা ছাত্রদের গুণগত মান কয়েক বছর ধরেই অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রয়েছে। চলতি শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য মূলত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে যেতেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ প্রবণতায় পরিবর্তন এসেছে। এখন বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন। ২০১০ সালে মাত্র ১ হাজার ৭২২ জন শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এ সংখ্যা বেড়ে ২৮ হাজার ছাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ শীর্ষ ২৫ দেশের একটি। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সাড়ে সাত হাজারের বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন, যাঁদের ৬২ শতাংশই স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। এর

পরিমাণ প্রতিবছর ৪ দশমিক ৯ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাওয়া এসব শিক্ষার্থী বাদে বাকি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমি একমত যে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা বড় সংখ্যক শিক্ষার্থী হয়তো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পরিবেশের শিকার।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক শিক্ষক ও গবেষকের মানের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন, যাঁরা রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ায় নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৩টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অঞ্চলপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, ধর্মীয় পরিচয়, অননুমোদিত আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নিয়োগসহ পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক উপাচার্যের আট বছরের সময়কালে প্রায় ৯০৭টি নিয়োগের মধ্যে অন্তত ৭৮টির ক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসরণ করা হয়নি।

প্রথম আলো: বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এক হাজারের মধ্যেও আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থাকে না। কী করলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ পাওয়া যাবে?

আতাউল: আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ড প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের দক্ষতা,

এসব বিভাগ থেকে সঞ্চারিত হওয়া নতুন জ্ঞানের মান ও পরিমাণ, শিক্ষার্থীদের কী মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং স্নাতক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের সাফল্যের ভিত্তিতে। এই প্রতিযোগিতায় সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের শিক্ষক ও গবেষকদের এমনভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে, যাতে করে (উন্নতি করতে না পারলেও) নিজেদের সর্বশেষ

অবস্থানটা ধরে রাখতে পারে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের নেতা ও সুবিধাভোগীরা বারবার ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাসংগ্রামসহ তাঁদের গৌরবময় রাজনৈতিক অতীত স্মরণ করেন। কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণার মান ও পরিমাণ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকেন তারা।

আমরা যদি আসলেই বর্তমান অস্থিরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তাহলে আমাদের আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩-এর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, এই মাইলফলক অর্জনের মধ্য দিয়ে 'গণতান্ত্রিক নীতি ও স্বায়ত্তশাসন এই প্রতিষ্ঠানে একীভূত হয়েছে'। ১৯৭৩ সালে এই অধ্যাদেশ জারির কিছুদিন পরই ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল সাত শিক্ষার্থী খুন হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সংঘাতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আরও ৬৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ জন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এসব মর্মান্তিক ঘটনার সাম্প্রতিক সংযোজন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) গত অক্টোবরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিগগিরই শীর্ষ এক হাজারের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখি না। এমনকি হয়তো তত দিন পর্যন্ত এ সম্ভাবনা নেই, যত দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৭৩-এর জিঞ্জিরমুক্ত না হতে পারবে।

প্রথম আলো: কেউ এখন কারিগরি শিক্ষায় যেতে চায় না। সবাই স্নাতক ডিগ্রি অর্জনে আগ্রহী। আগামীতে এর প্রভাব কেমন হবে?

আতাউল: বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে। এমনকি তা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন এখন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো নিষ্ক্রিয়তা ও নিজস্ব অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে কিছু

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাকৃতভাবে ভালো করছে। বাংলাদেশে যখন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না, তখনো পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো করতে পারেনি। আগামীতেও এর ভালো করার সম্ভাবনা কম।

প্রথম আলো: একসময় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভালো মানের গবেষণা হতো। এখন আর হয় না বলে শোনা যায়। আপনি এ নিয়ে কী ভাবেন?

আতাউল: কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটি সত্য। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় প্রথম উপাচার্য স্যার পি জে হার্টগ লক্ষ্যের ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘একজন মানুষ জ্ঞান সৃষ্টির শক্তি না থাকলেও ভালো শিক্ষক হতে পারেন। কিন্তু অগ্রসর কাজের ক্ষেত্রে আমি মনে করি, কল্পনাশক্তির সঙ্গে (জ্ঞান) সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ছাড়া কেউ মূলত শিক্ষা দিতে পারেন না। কাজেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় তখনই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে, যখন তার শিক্ষকদের জ্ঞান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা থাকবে।’ শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভুল করার সুযোগ খুব কমই ছিল।

সত্যেন বোসের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে ১৯২১ সালে নিয়োগ পান। ১৯২৬ সালে তিনি যখন ইউরোপে শিক্ষা ছুটিতে ছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপকের পদ খালি হয়। ১৯২৪ সালে সত্যেন বোস জাইটশ্রুফট ফুয়া ফিজিক সাময়িকীতে একটি গবেষণা নিবন্ধ (সহলেখক আলবার্ট আইনস্টাইন) প্রকাশ করেন, যা পরবর্তীকালে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান হিসেবে পরিচিতি পায়। কিন্তু অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেতে সত্যেন বোসের সে সময় পিএইচডি ডিগ্রি ছিল না। ড. দেবেন্দ্র মোহন বোসের তা ছিল। সে সময় সত্যেন বোস ছয়টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন নিজে। এই নিয়োগের বহির্নিরীক্ষক ছিলেন জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্নল্ড সমারফেল্ড। তাঁর পর্যালোচনার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক পদে দেবেন্দ্র মোহন বোসকে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। দেবেন্দ্র মোহন বোস সেই প্রস্তাব রাখতে অপারগতা প্রকাশ করলে সত্যেন বোসকে প্রস্তাব করা হয়, যাঁকে ১৯২৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারপর বুড়িগঙ্গায় অনেক জল গড়িয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্খলন ঘটেছে।

বর্তমান এই পরিস্থিতির একটি পরিণতি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক নিম্নমানের সাময়িকী, যা মূলত অনুষদের শিক্ষকদের প্রচারণাই চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুশীলনের সবচেয়ে বড় অপব্যবহারকারী। অনুষদের সদস্যরা যে গবেষণা করছেন, তা প্রমাণের জন্যই এগুলো প্রকাশ করা হয়। ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদ ছয়টি ষাণ্মাসিক ইংরেজি সাময়িকী এবং ১০ মাস অন্তর একটি বাংলা সাময়িকী প্রকাশ করত। ২০১৯ সাল নাগাদ এ ধরনের সাময়িকীর সংখ্যা বেড়ে ১৩টিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলা জার্নাল অনলাইন ২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমন প্রায় ৭৩টি সাময়িকী তালিকাভুক্ত করেছে, যার মধ্যে মাত্র আটটির (১ শতাংশের কম) বিষয়বস্তু এমন যে এগুলো বিশ্বের শীর্ষ ১৮ হাজার ৮৫৪টি সাময়িকীর তালিকায় জায়গা করে নিতে পারবে। আট বছরের কম সময়ের মধ্যে ২০১৯ সালের ২৭ অক্টোবর নাগাদ তালিকাভুক্ত সাময়িকীর সংখ্যা এখন ৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ১৪৩টিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগসহ সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনুষদের সদস্যদের পদোন্নতি নিশ্চিত করতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর দ্য অ্যাভেইলেবিলিটি অব সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন্সের ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিলের প্রতিবেদন অনুসারে, এই দুর্নীতি থেকে লাভবান হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা এবং খুব শিগগির এ ধরনের অপরাধ কমবে না।

মোহাম্মদ আতাউল করিম

ইতিবাচক দিকটা হলো, বাংলাদেশের কিছু গবেষণাগারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। সংখ্যাটা কম হলেও আমি বিশ্বমানের কয়েকটি গবেষণাগার দেখেছি, সেই সঙ্গে দেখা পেয়েছি কিছু অসাধারণ প্রতিভারও। তেমন সহায়তা ও উৎসাহ ছাড়াই নিজেদের মতো করে এসব গবেষক সম্ভাব্য সেরা সাময়িকীতে নিজেদের অনুসন্ধান প্রকাশ করছেন। বিষয়টি আমাকে এবং অন্যদেরও ব্যাপকভাবে আশান্বিত করে। অন্যদিকে, আমরা যদি অনেক বেশি দেরি করে ফেলি, তাহলে এসব মেধাবীর কেউ কেউ হয়তো বিদেশে পাড়ি জমাবেন।

প্রথম আলো: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে একুশ শতকের উপযোগী আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কী কী করা উচিত?

আতাউল: তথ্য, বর্তমান ধারা এবং কিছু প্রভাব বিস্তারকারীর আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সম্মান পুনরুদ্ধার অসম্ভব কিছু নয়। যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে, এটি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংস্কারের একটি পথ তৈরি করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দরকার রংভিত্তিক প্যানেল এবং এর অধ্যাদেশের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। অল্পকথায়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পুনর্গঠনের জন্য দরকার: অর্থহীন অভ্যন্তরীণ সাময়িকী প্রকাশনা বন্ধ করা; গবেষণা, পাঠ্যসূচি, শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে সততা ধরে রাখা এবং সার্বিকভাবে নৈতিকতা বজায় রাখা;শিক্ষা কার্যক্রমে অসদাচরণ করলে তা প্রতিহত করা; অনুষদ ও শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া এবং পুরস্কৃত করা; প্রাতিষ্ঠানিক নীতিতে জাতীয় রাজনীতির সামান্যতম প্রভাব যেন না পড়ে, তা নিশ্চিত করা; এবং নিয়োগ, পদোন্নতিসহ সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও প্রকৃত শিক্ষা দানের বিষয়গুলোই শুধু প্রাধান্য দেওয়া।